বিজ্ঞানী সি. ভি. রামন

ড. অচিন্ত্যকুমার মাইতি

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

স্মরণীয় মনীষীদের বরণীয় কাজগুলোকে জানার আগ্রহ নিয়ত আমাদের মধ্যে জন্মায়। সেইজন্য এঁদের জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে। কালের যাত্রাপথে আজ আমরা তাঁদের ভুলতে বসেছি। কর্মব্যস্ত জীবনে তাঁদের কথা স্মরণ করতে আমরা বিশেষ সচেষ্ট হই না। একটা যুগকে এগিয়ে নিয়ে যায় মহান মনীষীদের চিন্তাধারা, তাঁদের কর্মধারা আমাদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, তাঁরাই আমাদের চলার পথে প্রেরণা হয়ে থাকেন। তাঁদের জীবনাদর্শ, তাঁদের বাণী আজ আর যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে না, ফলে সমাজে এক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে তাঁদেরকে আবার আমরা নতুন করে স্মরণ করি, নতুন করে তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হই—এই অঙ্গীকার আমাদের মধ্যে আজ অটুট থাকুক। দেশের অগ্রগতি শুরু হয় বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে, আর সেই জয়রথের সারথি হলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা কী ছিল, তাঁদের বৈজ্ঞানিক অবদান আমাদের পূর্বসূরিদের কতখানি প্রভাবিত করেছিল সে ব্যাপারে আমাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার সময় এসেছে এবং সেই মূল্যায়নই হবে একবিংশ শতাব্দীতে দেশের উন্নয়নের একমাত্র অস্ত্র।

বাসুদেবপুর, হাওড়া

ড. অচিন্তকুমার মাইতি

৫.১.২০০৪

বিজ্ঞানী সি. ভি. রামন

'মহাবিশ্ব ঈশ্বরের সৃষ্টি, আর সেই সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তার অসীম সৌন্দর্য কিংবা স্রষ্টার অপার মহিমা উপলব্ধি করার জন্যই মানুষ—এ ব্যাখ্যা সহজ। কিন্তু এর অতীন্দ্রিয় বিশ্লেষণে সন্তুষ্ট নন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা খোঁজেন গূঢ়তর কারণ। গভীর কোনো সম্পর্ক।'

— পথিক গুহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

'নোবেল পুরস্কারের জন্য যখন আমার নাম ঘোষিত হল, তখন উপলব্ধি করলাম যে, এ জয় শুধু আমার একার নয়, আমার ও আমার সহকর্মীদের সাত বছর ধরে সাধনার সিদ্ধিলাভ। সেদিন সন্ধ্যায় ব্যাঙ্কোয়েটে যখন উপস্থিত ছিলাম, লক্ষ করলাম পশ্চিমি দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের ভিড়ের মধ্যে আমি একজন গলাবন্ধ কোট আর পাগড়ি পরিহিত ভারতীয়। তখন মনে হয়েছিল যে, আমি প্রকৃতপক্ষে আমার দেশের, আমার দেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছি। রাজা গুস্টাভের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের সময় নিজেকে খুব নগণ্য বোধ হচ্ছিল; সেটি খুব আবেগপ্রবণ মুহূর্ত হলেও নিজেকে খুব সংযত রেখেছিলাম। আমার আসনটি ছিল ওদের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকার নীচে। উপলব্ধি করলাম যে, আমার গরিব দেশ ভারতবর্ষ, তার নিজস্ব একটিও পতাকা নেই—এতেই সেদিন খুব মর্মাহত হয়েছিলাম।'—উদ্ধৃতিটি ভারতের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার প্রাপক

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের। এমন একজন দুর্লভ বিজ্ঞানী যাঁর বিজ্ঞান সাধনা ছিল নিছক বিজ্ঞানের জন্যই। অনেকে তাঁকে 'এক আদর্শবাদী প্রকৃতির সৌন্দর্যের পূজারী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে যে অনাবিল সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার রস আস্বাদন করে বিজ্ঞান সাধনায় সঞ্চারিত করেছিলাম। পরবর্তীকালে দেখা যায় এই সৌন্দর্য উপলব্ধিই হল তাঁর গবেষণায় অনুপ্রেরণার উৎসস্থল।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি লক্ষ করা যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। বিবেকানন্দের সেই শাশ্বত উক্তি এক্ষেত্রে মনে করিয়ে দেয়, 'It is from the middle class that the greatmen of the world arise.' বিশ্বে বিজ্ঞানের যা কিছু সাফল্য এসেছে তার বেশির ভাগ এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহা, সহিষ্ণুতা, পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেদের পরিবেশ তৈরি করে তোলার অনমনীয় মানসিকতা, সীমাহীন সাহস ও স্বাদেশিকতা তাদের মধ্যে জেগে ওঠে। ফলে একটা প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত করার জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ ও অন্যান্য গুণাবলির প্রয়োজন হয়, তা শুরুতে অর্জিত হয়। তাঁরা পরবর্তীকালে যশস্বী হন। চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন (সংক্ষেপে সি. ভি. রামন) এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি—

'I was born with a copper spoon.'

রামনের জন্ম চাষি পরিবারে। পরিবারের লোকেরা বংশানুক্রমে চাষবাস করতেন। মা ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পরিবারের মেয়ে। সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁর মাতামহের ভারতীয় দর্শনের ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি তীব্র আগ্রহ ছিল এবং অবিভক্ত বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন সংস্কৃত ভাষা শিখতে। রামনের পরিবারে ন্যায়শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব, তর্কের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় ইত্যাদি

বিষয়ে আলোচনা হত। রামনের চরিত্র গঠনে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা খুবই সহায়ক হয়েছিল।

রামন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অবস্থা কী ছিল তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

উনবিংশ শতক হল ভারতবর্ষের নবজাগরণের কাল। ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার সূচনা হয়েছিল কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতকে রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের প্রভাবে যুক্তিবাদ ও মানসিক চেতনার সমৃদ্ধি ঘটেছে। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজ অনুভব করল সমাজচেতনা ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অনুভব করলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, তার সমান্তরালে উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চা, তার প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপক প্রয়াস ছিল না বললেই চলে। যদিও এশিয়াটিক সোসাইটি তখনকার সময়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি, আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান ছিল, তবুও সবকিছুই সীমাবদ্ধ ছিল ইংরেজদের মধ্যে। সোসাইটিতে ভারত সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও তথ্য শাসকদলই গবেষণা করতেন। ১৮১৭ সালে কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকেরা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজের উদ্দেশ্য ছিল—

'The College is for the tution of the sons of the respectable Hindus in the English and Indian languages and in the literature and Science of Europe and Asia.'

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে জেমস প্রিন্সেপের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেজর হার্বট ও জেমস প্রিন্সেপ যুগ্মভাবে 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, পরে

পত্রিকাটির নামকরণ হয় 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'। ১৮৩৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হন প্রিন্সেপ। পত্রিকাটিতে প্রিন্সেপের বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল মেডিকেল কলেজ। শুরু হল আধুনিক ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শিক্ষা। এর পর প্রতিষ্ঠিত হল বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ, জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এগুলি সবই কলকাতায়। চুঁচুড়াতে স্থাপিত হল হুগলি মহসীন কলেজ। ১৮৩৮ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে চারজন বাঙালি ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এঁরা হলেন—উমাচরণ শেঠ, নবীনচন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ণ দে ও দ্বারকানাথ গুপ্ত। ১৮৪৪ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে উচ্চশিক্ষার্থে প্রথম বিলেত যান ভোলানাথ বসু, সূর্যকান্ত চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বসু ও গোপালচন্দ্র শীল। ১৮৪৫ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রস্তাব গ্রহণ করল যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ কলকাতা, চেন্নাই ও মুম্বাইতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন, আইন-কানুন—এসবই হবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। ১৮৫৭ সালে প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হল।

১৮৫৭ সালে যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তেমনই এই সময়ে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল—সেটি হল সিপাহি বিদ্রোহ। একটির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিস্তার, অপরটির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার প্রয়াস। দুটিরই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় বিজ্ঞানের নব অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে। উনিশ শতকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল মোট একশো সত্তরটি বিজ্ঞান শিক্ষার কলেজ, চারটি মেডিকেল কলেজ, পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি বিদ্যালয়। এরই মধ্যে

দেশে নানা আন্দোলন দেখা দিল—নীলবিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি। দেশে সব মিলে একটা বিপর্যয় দেখা দিল। ভারতীয়দের দুর্দশা চরমে উঠল। একদিকে চাকরি, শিক্ষা, চিকিৎসাক্ষেত্রে ইংরেজদের কর্তৃত্ব, অপরদিকে শিক্ষিত ভারতীয় বেকারের সংখ্যা বাড়তে লাগল। বিষয়টি ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে ভাবিয়ে তুলল। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য তৈরি হলেন। তারই ফলশ্রুতি ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম।

সমাজহিতৈষী প্রবাদপুরুষ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার উপলব্ধি করলেন, এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রকৃত প্রচলন করতে হলে উচ্চমানের বিজ্ঞানশিক্ষা ও মৌলিক গবেষণার সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন। ১৮৬৯ সালে 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন'-এ প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, উচ্চমানের গবেষণা করার জন্য একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। ওই প্রবন্ধে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন—

'আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান চাই ... যার কাজ হবে জনশিক্ষা। প্রতিষ্ঠানটি থাকবে সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন।'

প্রবন্ধে এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিশিষ্ট বাঙালিদের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। যাঁরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন তাঁরা হলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ।

১৮৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারি বিজ্ঞান গবেষণার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স।' এ বছরেই ২৯ জুলাই ২১০ নং বউবাজার স্ট্রিটে কালটিভেশনের নিজস্ব ভবনে কাজ শুরু হল। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি স্বাধীন